নারীবাদী নারী– মন্দ মানুষ নাকি একাকী যোদ্ধা!

লুলু আম্মানসূরা

নারীবাদী নারী অসুখী, উগ্র মেজাজি, উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষবিদ্বেষী ও কামুক... ব্লা ব্লা। নারীবাদী নারীদের নিয়ে এমন কত শত নেতিবাচক বিশেষণ যে আছে! আগে আমি ভাবতাম, এসব নেতিবাচক ভাবনা বোধহয় কেবল আমাদের মতন অনুন্নত দেশেই আছে, কিন্তু ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে আমার এই ধারণা পালটে যায়। ওই বছরের আগস্টে জনপ্রিয় মুখ Alyne Tamir তাঁর পেইজে `THE "F" WORD' শিরোনামে একটা তিন মিনিটের ভিডিও শো শেয়ার করেন, যেখানে বলা হয়েছে, নারীবাদীদের নিয়ে অনেক মানুষের ধারণা হচ্ছে, নারীবাদী নারীরা উগ্র মেজাজি ও পুরুষবিদ্বেষী। তিনি এসব ভুল ধারণার অযৌক্তিকতা ও নারীবাদিতা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও করেন। আমাকে যেই ব্যাপারটা ভাবিয়েছে তা হলো, Alyne-এর মতন মার্কিন আধুনিক নারীকেও যদি এসব ব্যাপারে কথা বলতে হয়, তার মানে দাঁড়ায়, উন্নত আর অনুন্নত নির্বিশেষে সব দেশের মানুষই নারীবাদীদের নিয়ে একইরকম নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। আমার এই ধারণা আরো পাকাপোক্ত হয় শিমামান্দা ন'গোজি আদিচের বক্তৃতা পড়ে। নাইজেরিয়ার নারীবাদী ও লেখক শিমামান্দা ন'গোজি আদিচে তাঁর এক বক্তৃতায় জানান যে, তিনিও সাংবাদিকসহ অনেকের কাছেই শুনেছেন, নারীবাদী নারীরা অসুখী এবং বর পায় না। অর্থাৎ, নারীবাদী নারীদের নিয়ে নেতিবাচক ধারণাগুলো স্থান ও পাত্রভেদে প্রায় একইরকম।

কিন্তু কেন?

যদি এই নেতিবাচকতা একটা নির্দিষ্ট দেশ, কাল ও মানুষদের হতো, তাহলে তা খুব সহজেই একটা ছকে ফেলা যেত। কিন্তু সব দেশেই যখন নারীবাদী নারীদের নিয়ে প্রায় একইরকম নেতিবাচক ধারণা, তখন তা একটু চিন্তাজাগানিয়া বটে। এই বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করলে আমরা নারীবাদী নারীদের ব্যাপারে অনেক মানুষের মনে মোটাদাগে তিনটা আপত্তি খুঁজে পাব, যথা–

১. যৌনতাকে গুরুত্ব দেওয়া (এটা আমাদের দেশের মতন রক্ষণশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে)

২. পুরুষবিদ্বেষ

এবং

৩. উগ্র মেজাজ ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

এবার এই তিনটা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাক। এই আলোচনায় আমরা আপত্তিগুলোকে যৌক্তিকতা, অযৌক্তিকতা ও বাস্তবতার নিরিখে দেখার চেষ্টা করব।

এক.

প্রথমেই আসি প্রথম ও এ দেশের সাপেক্ষে খুবই জনপ্রিয়(!) আপত্তি, 'যৌনতা'র ব্যাপারে!

বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ও আলোচিত নারীবাদীদের লেখালিখি ও জীবনযাপন নিয়ে অনেক পুরুষ প্রায়ই একটা মন্তব্য করে, এরা যৌন স্বাধীনতাকেই নারী স্বাধীনতা মনে করে। এ দেশের অন্যতম নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বহুবিবাহ ও যৌনতাসংশ্লিষ্ট লেখালেখির জন্য তাঁকে অনেক বাজে বিশেষণে

হরহামেশাই বিশেষায়িত করা হয়ে থাকে। আপত্তিওয়ালাদের ধারণা, অযৌন লেখালিখি করেই নারী স্বাধীনতা কায়েম করা সম্ভব।

তাদের এই আপত্তি কতটা যৌক্তিক বা অযৌক্তিক তা বলার আগে একটু অতীতে চোখ ফেরাই। আমরা জানি, কৃষিসভ্যতা আসার পরেই নারীকে গৃহবন্দি হতে হয়েছে। এরপর সভ্যতার ক্রমাগত উন্নতির সাথে পাল্লা দিয়ে পুরুষ সমাজের যত শক্তিশালী অবস্থানে গিয়েছে, নারী ততই দুর্বল অবস্থানে গিয়েছে। শক্তিশালী ও সবল পুরুষের মনোরঞ্জন ও বংশধর তৈরি করার মধ্যেই নারীর জীবনচক্র বন্দি হয়ে গেল। মানবপ্রজাতির সদস্যদের মধ্যে নারী সদস্যদের বন্দি হবার কারণ কিন্তু একটাই, নারীর প্রজননতন্ত্র। অর্থাৎ যৌনতা। যৌন কারণেই নারীকে গৃহবন্দি হতে হয়েছে, পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে বোরকাবন্দি হতে হয়েছে ও সময়ের পরিক্রমায় অবলা হতে হয়েছে। নারীর ঘর থেকে বের হবার পথে বড়ো প্রশ্ন হচ্ছে নিরাপত্তা। বাইরে নারী নিরাপদ নয়। কেন? উত্তর, যৌনতা। সতীত্ব ধারণা দিয়ে নারীকে অত্যাচারী স্বামীর পায়ের নিচে রেখেই ক্ষান্ত হয় নি সমাজ। সেই স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে নারীকে জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মেরেছে, বাধ্য করেছে সহমরণে। এইসব নারী নিপীড়নের পিছনের মূলমন্ত্র কিন্তু একটাই, যৌনতা।

সন্তানের পিতৃত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতেই সতীত্ব ধারণার উৎপত্তি। সেই ধারণা এতটাই প্রকটভাবে ছড়িয়েছে যে পুরুষদের মধ্যে নারীর যোনি একটা সম্পদ বা পণ্য মর্যাদায় নেমে এল। শুরু হয়ে গেল পণ্য নিয়ে মারামারি ও কাড়াকাড়ি। এর ফলে শুরু হলো নিরাপত্তাব্যবস্থা। সম্পদের মালিক নিজ সম্পদকে অক্ষত ও নিরাপদ রাখতে তৈরি করল দুর্গ অথবা জেলখানা। সেখানে বন্দি হলো নারী বিনা অপরাধে অথবা যোনিধারক হবার অপরাধে। অর্থাৎ, মানবপ্রজাতির নারী ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ও বৈষম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ার একমাত্র কারণ হলো, নারীর প্রজননতন্ত্র বা যৌনতা। সুতরাং, অযৌন লেখা লিখে কখনোই ও কিছুতেই নারী স্বাধীনতা কায়েম করা সম্ভব না।

তাহলে যারা নারীবাদীদের কাছে অযৌন লেখা আশা করে, কেন করে? তারা নারীবাদিতা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তা মুখে বললেও যৌনতাকেন্দ্রিক লেখাকে কেন গ্রহণ করছে না?

এর কারণ হচ্ছে, হাজার বছরের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় অভ্যস্ত মন ও মগজের ভিত্তিতে আছে পুরুষতন্ত্র। তাই ভিত্তিমূল কেপে উঠলে প্রাণীর সহজাত প্রবণতায় সে অস্তিত্বসংকটে পড়ে ও অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার ভয়ে আক্রান্ত হয়। তাই পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার ভিত্তি দিয়ে যে মন-মগজ গঠিত, সেই মন-মগজে নারীবাদ ধারণ করা প্রায় অসম্ভবই বটে। তাই তারা বুঝতে পারে না যৌনতার গুরুত্ব। তাই তারা সইতে পারে না নারীর যৌন স্বাধীনতা ও অধিকারের পক্ষে কথা বলা।

এবার বলি কীভাবে শুধু নারীর যৌন স্বাধীনতা দিয়েই নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা যায়। এই আলোচনা শুরু করার আগে মানুষ বাদে প্রাণিজগতের অন্য প্রাণীদের দিকে একটু তাকাতে চাই। আমরা যদি প্রাণিজগতের দিকে তাকাই, তাহলে সেখানে কিন্তু যৌনতার জন্য নারীকে বন্দি করার ঘটনা দেখতে পাব না। বেশিরভাগ প্রাণী প্রজননঋতু ছাড়া প্রজনন করে না। অর্থাৎ ওরা নিম্নবুদ্ধির প্রাণী হয়েও যৌনতাকে স্বাভাবিক জৈবিকতা হিসেবেই গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে, যা উন্নত বুদ্ধির মানুষের পক্ষে আজও সম্ভব হয় নি। তারা বরং নানা ট্যাবুতে আক্রান্ত। নারীর যৌন স্বাধীনতা ছাড়া যৌনতাকে স্বাভাবিক জৈবিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। একে পণ্য থেকে অপণ্য বানাতে হবে। যতক্ষণ পণ্য হিসেবে থাকবে, ততক্ষণ বেচাকেনা থাকবে। যতক্ষণ বেচাকেনা থাকবে, ততক্ষণ মানুষ মানুষের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে। যতক্ষণ মানুষ মানুষের হাতের পুতুল হয়ে থাকবে, ততক্ষণ মানবতা থাকবে না। অর্থাৎ, মানবতাবাদী মনই নারীবাদী আর নারীবাদী নারী-পুরুষ সবাই নারীর যৌন স্বাধীনতার পক্ষে লড়বে।

যৌন স্বাধীনতা, সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার, অর্গাজম ও সতীপর্দার বিরোধিতা, প্রভৃতি শব্দ ও বিষয়গুলো অনেক পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক মগজবিশিষ্ট নারীর মনে ভয় ধরিয়ে দেয়, দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত করে দেয় ও ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। তারা মনে করে, এসব নিয়ে আলোচনা সতী নারীদের অসতী করে ফেলবে, সংসার টিকবে না এবং সন্তানেরা বাবা-মা থাকতেও এতিম হয়ে যাবে। তাদের এই ধারণাগুলো আপাতদৃষ্টিতে সঠিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচণ্ডরকম ভুল ও অজ্ঞতায় পূর্ণ। সতীত্ব ব্যাপারটাই নারীকে প্রচণ্ডরকম খাটো করে দেয়। এর মাধ্যমে একজন মানবীর রক্তমাংসের সমগ্র দেহ, মগজ ও হৃদয়কে অস্বীকার করে কেবল যোনিপথকে স্বীকার করা হয়। একজন মানবীর চিন্তা, চরিত্র ও কর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল তার প্রজনন অঙ্গকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ বাস্তবতা এটাই যে, প্রচলিত টার্মে সতী থাকা খুব সহজ হলেও সৎ জীবনযাপন ও চিন্তা ধারণ করে প্রকৃত সতী হওয়া পাহাড়সম কঠিন। নারীকে যৌনাঙ্গে বন্দি করে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী বানানোর ধান্ধার নাম হচ্ছে সতীত্ব। নারীবাদীরা যেহেতু প্রজননতন্ত্রের দেয়ালে ঘেরা জীবন থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য কাজ করে, কাজেই সতীত্ব ধারণাকে তাদের আঘাত করতেই হবে। নয়ত নারী তার জীবন, মন ও মগজকে নিজের যোনিপথেই খুঁজে-বুঝে নেবে, যা মানবপ্রজাতির সদস্য হিসেবে বেমানান আচরণ এবং সমগ্র মানবপ্রজাতির অসম্মান।

পুরুষতন্ত্র কি জানে ও বুঝে যে নারীর সতীত্ব ধারণা কাকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে?

গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, এই ধারণা নারীর চাইতে পুরুষ ও মানবসভ্যতাকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কেননা, এর মাধ্যমে নারীরা কেবল যোনিপথের পাহারাদার হয়েই দায়মুক্ত হয়েছে এবং মানবতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র, চিন্তা, প্রভৃতি বিষয় থেকে দূরে থেকেও নিজেকে মহৎ ভাবতে পেরেছে। অথচ একজন যোনিপথের কঠোর পাহারাদার মগজহীন জীবনযাপন, হিংসা, লোভ, অহংকার ও অজ্ঞতা দিয়ে তার স্বামীর জীবনকে নরক বানিয়ে ফেলতে পারে এবং সন্তানদের নিজের মতন মূর্খ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে উন্নত চিন্তা, প্রজ্ঞা, অহিংসা, প্রেম ও নির্লোভ থাকার চর্চার মাধ্যমে একজন নারী তার স্বামীর জীবনকে স্বর্গ বানাতে পারে ও সন্তানদের জীবনের সেরা শিক্ষক হয়ে যেতে পারে।

দুই.

এবার আসি দ্বিতীয় আপত্তি, 'পুরুষবিদ্বেষ'-এ।

এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করার আগে মানবজাতিতে চলমান অন্যান্য আন্দোলনের দিকে এবং আন্দোলনকারীদের নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যে কোনো আন্দোলনে সাধারণত দুটো পক্ষ থাকে, একপক্ষ সবল ও অত্যাচারী এবং অন্যপক্ষ দুর্বল এবং অত্যাচারিত। যোদ্ধারা মানে আন্দোলনকারীরা অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যখন মাঠে নামে, তখন তাদের মনের ভেতরে থাকে অত্যাচারিত হবার যন্ত্রণা এবং অত্যাচার দূর করার আকাঙ্ক্ষা। এই দুই অনুভব যোদ্ধার মনে বিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরি করে। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ যুদ্ধের নিয়ামক ও প্রভাবক দুই হিসেবেই কাজ করে; যেমন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আমরা ঘৃণা করেছিলাম ও আজও করি পাকিস্তান ও পাকিস্তানিদের এবং সেই সময় পাকিস্তান ঘৃণা করত বাংলাদেশিদের। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষ না থাকলে যুদ্ধই হতো না। আবার, শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকেরা মালিকপক্ষকে শত্রুজ্ঞান করে থাকে। এই বিরূপ মনোভাব না থাকলে আন্দোলনই হতো না। অর্থাৎ, যে কোনো যুদ্ধ, বিরোধ ও আন্দোলনের নিয়ামক ও প্রভাবক হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

এখন নারীবাদিতার দিকে চোখ ফেরাই। নারীবাদিতা মূলত একটা আন্দোলন বা একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পক্ষশক্তি নারী-পুরুষের সমানাধিকার চায়, আর অন্যপক্ষ তা দিতে নারাজ এবং তারা পুরুষকে এগিয়ে রাখতে চায়। আমাদের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতি সবকিছুতেই পুরুষতন্ত্র এমনভাবে মিশে আছে যে

নারীবাদী নারীদের ঘর, বাহির ও সর্বত্র একটা কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। আমি এই যুদ্ধে সচেতনভাবে নারীবাদী পুরুষদের নাম বাদ দিয়েছি। এটা অনস্বীকার্য যে, অনেক অনেক পুরুষ নারীবাদী ছিলেন ও আছেন। তাদের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া নারীদের আজকের এই অবস্থানে আসা সম্ভব ছিল না; যেমন, বেগম রোকেয়ার স্বামীর সাহায্য ছাড়া তাঁর এতদূর আসা সম্ভব ছিল না, রামমোহন রায়কে ছাড়া সতীদাহ প্রথা দূর করা সম্ভব ছিল না, বিদ্যাসাগরকে ছাড়া বিধবাবিবাহ প্রথা শুরু করা অসম্ভব ছিল। নারীবাদী পুরুষদের এরকম আরো অনেক অবদান ছিল, আছে ও থাকবে। তবে এই যুদ্ধে নারীবাদী পুরুষেরা যতটা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতেন যদি তারা নারী হতেন। একজন নারীবাদী পুরুষের বিরুদ্ধে দুনিয়া গেলেও অন্তত ঘর তার পক্ষে থাকে, বিপক্ষে থাকলেও কেউ প্রভাব দেখাতে সাহস পায় না। নারীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হয় না। নারীবাদী নারী মুখ খুললে তার পরিবার পরিজনকেও হারাতে হয় (অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে)।

নারীবাদী নারীরা অধিকার আদায়ের আন্দোলনে খুব একা। তাদের আন্দোলন শুরু হয়ে যায় জন্মের আগেই, আলট্রাসনোগ্রাফিতে কন্যাসন্তানের আগমনীবার্তা পাবার সাথে সাথেই বাবা-মায়ের সাথে অপ্রস্ফুটিত একটা বাচ্চার যুদ্ধে নেমে যেতে হয় কোনো কিছু না জেনে-বুঝেই। এই যুদ্ধে তার অস্ত্র নেই, অস্ত্রহীনতাই তখন একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে বাচ্চাটাকে রক্ষা করে। বাবা-মা অনাগত সন্তানের অসহায়ত্ব ও নির্দোষ অবস্থানের কথা ভেবেই বাচ্চাটার কন্যা হবার দোষ ক্ষমা করেন অথবা অল্প কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে রাখেন। জন্মের পর একটু বুদ্ধি হলেই সে দেখে তার ভাই-বাবা-চাচাসহ প্রায় সব আপন পুরুষই তার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। কারণ একটাই, সে মেয়ে। সে আরো অবাক হয়ে দেখে, তার মা-বোন-খালা-চাচিসহ সমস্ত আপন নারীই পুরুষের এই ছড়ি ঘোরানোকে সমর্থন করছে এবং তাকেও মেনে নিতে বলছে। ছোট থেকেই একটা মেয়ে নিজেকে নীচুজাত ও পুরুষকে উঁচুজাত হিসেবে দেখতে দেখতে তার মনে বিদ্রোহ আসে। এই বিদ্রোহ তো শুধু অশরীরী পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেই নয়, শরীরী পুরুষের বিরুদ্ধেও। তাই যুদ্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রের অনিবার্য নিয়ম অনুযায়ীই এই পুরুষবিদ্বেষ।

তিন.

নারীবাদের চর্চা নারীদের উগ্র, উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, ধূমপায়ী, বহুগামী ও সংসারবিমুখ করেছে– এই দাবি বা মন্তব্য অনেকেই করে থাকে। তারা নিজের চোখেই দেখেছে, নারীবাদের জ্ঞানবর্জিত নামাজি, নম্র, ভদ্র, স্বামীর বাধ্য ও একান্ত অনুগত, সংসারী ও প্রেমময়ী নানি, দাদি, মা, খালা ও চাচিদের। অন্যদিকে তারা যখন দেখে, নারীবাদের চর্চা এক ছোঁ মেরে নারীর দেহ ও মন থেকে সমস্ত কোমলতা, পেলবতা ও মায়া কেড়ে নিয়েছে এবং দিয়েছে কাঠিন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, সংসারবিমুখতা, কুটিলতা ও ক্ষতিকর জীবনযাপনের অভ্যাস, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই নারীবাদকে তাদের কাছে মন্দ বা অজ্ঞানতার চর্চা মনে হতেই পারে। কিন্তু নিবিড়ভাবে ভাবলে ও দেখলে তারা সত্যের ভেতরের সত্যটুকু টের পেত।

প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে হলে আগে আমাদের দাসত্ব ও মহত্ত্বের পার্থক্য জানতে বুঝতে হবে। দাস অনুগত, বাধ্য ও প্রভুর প্রতি ক্ষমাশীল হবে। এটা দাসের মহত্ত্ব নয় বরং চরিত্র। অন্যদিকে মহত্ত্ব হচ্ছে, দাস নয় এমন স্বাধীন মানুষ যখন নিজের উন্নত চিন্তা ও মানবিক উপলব্ধি দিয়ে তাড়িত হয়ে বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, সহমর্মী, ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন।

নারীকে যখন দাস বানিয়ে রাখা হয় তখন সে স্বাভাবিকভাবেই বাধ্য, অনুগত ও প্রভুর ইচ্ছার পুতুল হয়েই থাকবে। দাস বদমেজাজি ও উচ্ছৃঙ্খল হবার সাহস ও সুযোগ কোনোটাই রাখে না। অন্যদিকে, স্বাধীন মানুষের কাছে মন্দ ও ভালো দুটোই গ্রহণের সুযোগ আছে। নারীদের যখন স্বাধীনতা দেওয়া হবে তখন কিছু নারী অবশ্যই বিপথগামী হবে। এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীন পুরুষেরাও একই কারণে বিপথগামী হয়।

এ ছাড়া, এতদিন বন্দি থেকে নারীরা এখনো স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি। তার কাছে এটা নতুন কিছু পাওয়া। আজন্ম কয়েদে থাকা বন্দি যদি বিদ্রোহ করে ও যুদ্ধ করে কয়েদ থেকে মুক্তি পায়, তাহলে সে মুক্ত পৃথিবীতে সাথে সাথেই অভ্যস্ত হতে পারবে না। তার কাছে এই স্বাধীনতা ও মুক্ত দুনিয়া নতুন। সে জানে না এই জগতের কোথায় কেমন ঠাঁই আছে আর নাই। তাই তাকে ঠকানো সহজ, তার সাথে খেলা করা সহজ এবং তাকে ভুল পথে পাঠানোও সহজ। তখন তাকে অভ্যস্ত হবার সময় দিতে হবে, তাকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে– এটাই মানবিক চিন্তা। তাকে কয়েদেই রাখতে হবে, এটা কোনো মানবিক চিন্তা হতে পারে না। ঠিক তেমন অবস্থা নারীবাদী নারীদের। তারা চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। এতদিনের চেনাজানা পুরুষতান্ত্রিক জীবনযাপনের খাঁচা তারা ভেঙেছে। স্বাধীন চিন্তাজগতে প্রবেশ করে সে ভালো বা মন্দ যে কোনো কিছু দিয়েই প্রভাবিত হতে পারে। সেই মন্দ দিয়ে নারী স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

উপরের তিনটি বিষয় ছাড়াও আরো অনেক কথাই নারীবাদী নারীদের বিরুদ্ধে বলা হয়। এর মধ্যে একটা কথা আমার খুব কানে বেজেছে; তা হলো, নারীবাদী নারীরা বর পায় না। এটাই ত স্বাভাবিক যে, যোদ্ধারা সঙ্গী পাবে না। নারীবাদী নারীরা যোদ্ধা। এ ছাড়া, এটা তো পুরুষদের জন্য খুব লজ্জার কথা যে, এই যুগে এসেও পুরুষেরা স্বাধীন চিন্তা-চেতনার নারীর স্বামী হবার সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না!!

আমার কাছে প্রত্যেকটা নারীবাদী সম্মানের পাত্র এবং নারীবাদী নারীরা অধিক সম্মানের পাত্র। কেননা তারা হচ্ছেন, একাকী যোদ্ধা! যোদ্ধারা যুদ্ধ করে আহত-নিহত হয় কিন্তু যুদ্ধের সুফল আশা করে না, সুফল পায়ও না। সুফল পায় পরবর্তী প্রজন্ম, সুফল পায় যারা যুদ্ধ করে নি তারা। যুদ্ধের জীবন ও যোদ্ধাদের জীবন যাপন করতে দম লাগে, সাহস লাগে এবং শক্তি লাগে। পৃথিবীর সব সাহসী নারী যোদ্ধাকে আমার লাল সালাম।

লুলু আম্মানসূরা প্রভাষক, জীববিজ্ঞান, কোয়ালিটি এডুকেশন কলেজ, ঢাকা। ammansura.bd@gmail.com